নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা ১৫ পৃঃ ১৪৯-১৬০
© ২০১০ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রান্তিকীকরণ প্রক্রিয়া: সিলেটের চা-শ্রমিক প্রসঙ্গ

চৌধুরী ফারহানা ঝুমা*

১. ভূমিকা

উৎসগত দিক থেকে চা-শ্রমিকরা বাঙ্গালিদের চেয়ে পৃথক সংস্কৃতির অংশিদার। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ইংরেজ সময়ে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হতে এদেরকে নিয়ে এসে বাংলাদেশের চা-বাগানের কাজে নিযুক্ত করা হয়। তখন থেকে চা-শ্রমিকরা বাংলাদেশের বিভিন্ন চা-বাগান এলাকায় বসবাস করছে। চা-শ্রমিকদের অনেকেই এখন তাদের ঐতিহ্যগত পরিচয়ের গন্ডি থেকে বেরিয়ে এসে বৃহত্তর বাঙ্গালি জনগোষ্ঠীর সাথে মিশছে। এক্ষেত্রে তারা আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অসম ক্ষমতার সংঘাতের সম্মুখীন হচ্ছে। এই প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে চা-বাগানের গন্ডি থেকে বেরিয়ে আসতে ইচ্ছুক এসকল জনগোষ্ঠী আবার প্রান্তিকও হয়ে পড়ছে। আলোচ্য গবেষণায় চা-শ্রমিক জনগোষ্ঠীর যে অংশ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তাদের পূর্বপুরুষ ছিল চা-শ্রমিক এবং বর্তমানে তাদের আত্মীয়-স্বজনের অনেকেই চা-চাষে নিয়োজিত। এরা আবার অন্যান্য পেশায় ও জড়িত। এ প্রবন্ধে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে চা-শ্রমিকদের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, চা-শ্রমিক জনগোষ্ঠী নামের নির্মাণ প্রক্রিয়া, তাদের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য, আদিবাসী হিসেবে পৃথক সংস্কৃতি চর্চার ধরণ, মূলধারার বাঙ্গালি জনগোষ্ঠীর সাথে সামাজিক সাংস্কৃতিক মিথস্ক্রিয়া এবং আদিবাসী চা-শ্রমিক জনগোষ্ঠীর উপর এ মিথস্ক্রিয়ার প্রভাব। একদিকে চা-শ্রমিকের ঐতিহ্য অন্যদিকে আধুনিক জীবন-যাপনের প্রভাব এ দ্বৈত পরিচয় দ্বারা সৃষ্ট প্রান্তিকতা অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেছে ঔপনিবেশিক সময়ের নিয়ম-নীতি তাদেরকে প্রান্তিক করেছে এবং বর্তমান সময়ের দ্বৈত ব্যবস্থা তাদেরকে নতুন ধরণের প্রান্তিকীকরণের সম্মুখীন করেছে।

চা-বাগানের সীমানার বাইরে বসবাস করা চা-শ্রমিকদের প্রতিনিয়ত মূলধারার বাঙ্গালি জনগোষ্ঠীর সাথে মিথস্ক্রিয়া করতে হয়। এ মিথস্ক্রিয়া দ্বারা চা-শ্রমিকরা যে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয় এবং এ প্রতিযোগিতায় অসম ক্ষমতার দ্বন্দ্ব কিভাবে প্রতিনিয়ত তাদেরকে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রান্তিক করে দেয় তা বোঝার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ গুরুত্ব পেয়েছে : ১) গবেষণা এলাকার চা-শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা তুলে ধরা। এই চা-শ্রমিক জনগোষ্ঠী কিভাবে তৈরি করা হল এবং এই পেশা, সংস্কৃতি, জীবন-যাপন পদ্ধতি কিভাবে তাদের আচার-আচরণকে প্রভাবিত করে। বৃহত্তর জনগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা এবং এভাবে নিজ সংস্কৃতিকে আলাদা করে। ২) চা-শ্রমিক জনগোষ্ঠী তাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সীমানা অতিক্রম করে কিভাবে মূল ধারার জনগোষ্ঠীর সাথে মিশতে চেষ্টা করে নতুন ধরণের প্রান্তিকতার শিকার হচ্ছে। ৩) আধিপত্যশীল বাঙ্গালি সংস্কৃতির সাথে

* সহকারী অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট

চা-শ্রমিকদের অধ:স্তন সংস্কৃতির অভিযোজনের প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ ও এর মাধ্যমে যে নতুন ধরণের প্রান্তিকতা তৈরি হয় তা তুলে ধরা ।

এই গবেষণায় মূলত সাক্ষাৎকার ও জরিপের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণার একক ছিল গৃহস্থালী এবং তা আদিবাসীদের পিতৃতান্ত্রিক ও যৌথ পরিবার ভিত্তিক গৃহস্থালীকে গবেষণার একক রূপে নির্ধারণ করা হয়েছে। ১২টি এরূপ গৃহস্থালীর ৩০ জন চা-শ্রমিককে নমুনায়নের মাধ্যমে উত্তরদাতা হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছে। বালুচর এলাকায় বসবাসরত চা- শ্রমিকদের কাছে এটি 'সুরমা ভ্যালি' নামে পরিচিত। জমিদারী প্রথা প্রবর্তনের সময় 'দলদলি' 'মালনিছড়া' সহ বেশ কিছু চা-বাগানকে নিয়ে 'সুরমা ভ্যালি' নামক এলাকা গড়ে ওঠে, বালুচর এলাকটি এই 'সুরমা ভ্যালি ভ্যালি' নামক এস্টেটের একটি অংশ। এরকম আরও অনেকগুলো ভ্যালি আছে যেখানে চা-শ্রমিকরা বাস করে এবং তাদের নিজস্ব নামে এসকল এলাকাকে পরিচিতি দেয়। এখানে চা-শ্রমিকদের ৪৮টি গৃহস্থালী রয়েছে যেখানে প্রায় ২৮০ চা-শ্রমিক বসবাস করে। তাদের বাসস্থান সাধারণত: একটু উঁচু টিলার উপর তৈরি করা হয়।

২. তাত্ত্বিক প্রেক্ষিত

বাংলাদেশের চা-শ্রমিকদের আদিবাস মাদ্রাজ, বিহার, উড়িষ্যার অত্যন্ত দরিদ্র এলাকায়। তাদের নিজস্ব পেশার কোন সুনির্দিষ্ট রূপ ছিলনা। চা-শ্রমিকদের ক্ষেত্রে ইংরেজরা হল মালিক। এই মালিক অনেক অর্থ বহন করে। একদিকে জমির মালিক অন্যদিকে ব্যক্তিসত্তার মালিক- আবার ভগবান বা ঈশ্বর রূপেও মালিক বলা যায়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে তারা হল ভাগ্যবিধাতা। চা-শ্রমিকরা তাদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, বিচার, আদালত সবকিছুর জন্য ইংরেজদের মুখাপেক্ষী যারা আবার তাদের চেয়ে পৃথক ও উচ্চে অবস্থান করছে, পবিত্র ও অপবিত্র ধারণা দ্বারা যারা পৃথক। অর্থাৎ ধর্মীয় বিশ্বাসকে বাস্তব সম্পর্কের ক্ষেত্রে রূপান্তর করা হয়েছে। এরূপ আবদ্ধ চিন্তার মধ্যে থেকে চা-শ্রমিকদের স্বতন্ত্র আত্মপরিচয়ের চেতনা জেগে ওঠা প্রায় অসম্ভব। আত্মপরিচয়ের এ সংকট সাধারণ নাগরিকদের তুলনায় আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সংকটে বিভ্রান্তিতে ফেলে দেয়। যার ফলে তারা আসলে কে- সে বিষয়টি তাদের কাছে অস্পষ্ট থেকে যায়।

স্বাধীন সার্বোভৌম বাংলাদেশেও অন্যান্য আদিবাসীদের মত চা-শ্রমিকরা আত্মপরিচয়ের সংকটে ভোগে যা তাদের প্রান্তিকীকরণ প্রক্রিয়ার অন্যতম একটি ধাপ। ফলে নির্বাচনে তারা ভোট দেয়ার অধিকার পেয়েছে ঠিকই কিন্তু কেন ভোট দিচ্ছে বা কাকে দিচ্ছে সে ব্যাপারে তাদেরকে একধরণের উদাসীনতার মধ্যে থাকে। আত্মপরিচয় ভিত্তিক 'এথনিক' ধারণার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যবহার উনবিংশ-বিংশ শতকের একটি বহুল আলোচিত বিষয়। তবে এ রাজনৈতিক ভিত্তি নির্মাণে ঔপনিবেশিক শাসন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। স্টানলি তামবিয়া (Stanley J. Tambiah 1989) দেখান কিভাবে বৃটিশ শাসন উপনিবেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ছোট ছোট ইস্যুতে সাদৃশ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন এথনিক গোষ্ঠীর সৃষ্টি করেছে এবং সমাজকে শতধা বিভক্ত করে তুলেছে। ঔপনিবেশিক শাসনের

মূল কৌশল ছিল বিভিন্ন অঞ্চলের অন্তর্নিহিত বিভাজনকে টিকিয়ে রাখা এবং একই অঞ্চলে বসবাসরত মানুষকে মানসিক উত্তেজনার মধ্যে রাখা। এ নির্দিষ্টকরণ ও মানদন্ড ভিত্তিক বিভাজন রীতি একটি দুমুখো ছুরি হয়ে কাজ করে। একদিকে এ খন্ড খন্ড গোষ্ঠীগুলো সামাজিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়ায় অন্যদিকে এরা বিভাজনের একেকটি দেয়াল হিসেবে আবির্ভূত হয়। এ বিভাজন তৈরির মাধ্যমেই বৃটিশরা তাদের শাসন চালিয়ে যায়। ঔপনিবেশিক শাসকদের দ্বারা এথনিক জনগোষ্ঠী নির্মাণ প্রক্রিয়ায় চা-শ্রমিকরা আলাদা একটি জনগোষ্ঠী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে কারনে তা হলো- ক) সবাই চা-শ্রমিক হতে পারেনা বা হয়না, এ পেশা একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর আত্মপরিচয়ের সাথে যুক্ত। খ) বংশ পরম্পরায় তারা এ কাজ করে থাকে। গ) একটি নির্দিষ্ট এলাকায় তারা বসবাস করে। ঘ) অন্তঃ বিবাহ এদের সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ঙ) চা-শ্রমিক নয় এমন লোকেরা তাদের প্রতি একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করে। এসকল দিক থেকে চা-শ্রমিকরা একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠী যা উপনিবেশিক শাসনের অবদান। উপনিবেশিক সময়ে সংগ্রহ করা এ চা-শ্রমিকদের দেয়া হয় স্বতন্ত্র আত্মপরিচয় এবং তারা হয়ে পড়ে একটি 'এথনিক জনগোষ্ঠী'। পরবর্তীতে উপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটানোর পেছনে বিভিন্ন স্থানে যে স্বাধীনতার আন্দোলন শুরু হয় তা মূলত এই এথনিক সচেতনতারই ফল। ইউরোপীয় ধ্যানধারণায় উদ্বুদ্ধ বুর্জোয়া মতাদর্শভিত্তিক যে আত্মপরিচয়, ন্যায়বিচার, সুবিচার, সমতা ইত্যাদির ধারণা বিকাশ ঘটতে থাকে তার সাথে একটি এথনিক গোষ্ঠীর সার্বভৌমত্বের ধারণার যোগসূত্রে গড়ে ওঠে জাতি রাষ্ট্র।

এথনিক জনগোষ্ঠীর অবস্থান নিয়ে নতুন জাতিরাষ্ট্রে সবসময়ই দোদুল্যমান তা-ই ছিল যা সামাজিক সাংস্কৃতিক পর্যায়ে প্রভাব ফেলেছে। জাতীয় পর্যায়ে নেয়া বিভিন্ন নীতিমালা প্রণয়নের দ্বারা সংখ্যালঘুদের প্রান্তিকীকরণ প্রক্রিয়া একটি বাস্তব ঘটনায় পরিণত হয়েছে। যেহেতু জাতীয়তাবাদ একটি বিশ্বাসের ব্যাপার

ফলে এর মতাদর্শ ও বাস্তবতার মাঝে বিশাল পার্থক্য থাকে যা প্রকাশ পায় নাগরিক ও অনাগরিক insider ও outsider- অথবা সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরুও ধারণায়। চা-শ্রমিকদের প্রান্তিকতা ও বর্তমান আত্মপরিচয়ের যে সংকট তা এ কারনেই বাঙ্গালিরা চা-শ্রমিকদের সংস্কৃতির অনেক বৈশিষ্ট্য ধারণ করে, আবার চা-শ্রমিকরাও বাঙ্গালি সংস্কৃতির অনেক কিছু অনুসরণ করছে ও করে। কিন্তু জাতীয়তাবাদী ধারায় এসে তা হয়ে গেছে শুধু বাঙ্গালিদের সংস্কৃতি ও চা-শ্রমিকরা হয়ে যায় বহিরাগত। রাজনৈতিক পরিসর থেকে সামাজিক, সাংস্কৃতিক সকল ক্ষেত্রে এসে এ দ্বিমূখী নীতির প্রভাবে প্রান্তিকতা চা-শ্রমিকদের আত্মপরিচয়কে সংকটাপন্ন করে তোলে।

জাতিরাষ্ট্রগুলো যে দেশপ্রেমের চর্চা করে তার মূলে কাজ করে 'জাতীয়তাবাদ' ও 'এথনিসিটি' র ধারণা। চা-শ্রমিক আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রান্তিকতা প্রক্রিয়াকে বোঝার জন্য এই 'এথনিসিটি', 'জাতীয়তাবাদ' প্রত্যয় দুটির বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। থমাস এরিকসেন (Thomas Eriksen, 1993) 'এথনিসিটি' প্রত্যয়টিকে সংজ্ঞায়িত করেন তুলনামূলক

দৃষ্টিভঙ্গীতে যার একদিকে থাকবে 'এথনিক' জনগোষ্ঠী এবং অন্যদিকে 'অ-এথনিক' জনগোষ্ঠী এবং তাদের মধ্যে প্রাত্যহিক একটি মিথস্ক্রিয়ার ভিত্তিতে এথনিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই সম্পর্কের ভিত্তি হল 'আমরা', 'তারা' মতাদর্শ। ফলে যখনই একটি জনগোষ্ঠী এথনিক বলে পরিচিতি পায়, অপরাপর গোষ্ঠী থেকে তাদের স্বাতন্ত্র্য তৈরি হয়। আমবার কোহান (Amber Cohan, 1974) দেখান যে তাদের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকে, অন্ত র্বিবাহ, সকলের সাধারণ পূর্বপুরুষ,সাধারণ ধর্ম । ফ্রেডরিক বার্থ (Fredrick Barth, 1996) মনে করেন যে এথনিসিটি একজন ব্যক্তিকে তার উৎস, ইতিহাস, প্রেক্ষাপট অনুযায়ী স্বতন্ত্র্যভাবে আত্মসচেতন করে তোলে। তিনি দেখান, 'গোষ্ঠি', 'কেটাগরি', 'সীমানা'- এই শব্দগুলো এখনও এক ধরণের সুনির্দিষ্ট স্বতন্ত্র্য পরিচিতির সৃষ্টি করে যার ভিত্তি হল 'inclusive' ও 'exclusive' এর ধারণা। তারা সকলেই মিথস্ক্রিয়ার বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়েছেন, আর এই মিথস্ক্রিয়া ঘটে থাকে অপর একটি গোষ্ঠীর সাথে। জাতিরাষ্ট্রে সেই গোষ্ঠী যদি মূল ধারার জনগোষ্ঠী হয় তখন তুলনামূলকভাবে এথনিক গ্রুপগুলো সংখ্যালঘু ব্যক্তিতে পরিণত হয়।

'এথনিক' প্রত্যয়টির এই ধারাবাহিক আলোচনার সূত্র ধরে চা-শ্রমিকরা আদৌ 'আদিবাসী' কিনা সেদিকটি বিবেচনায় আনা জরুরী কারণ নিতান্ত বাণিজ্যিক মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হতে এদের সংগ্রহ করে চা-বাগানের কাজে নিযুক্ত করা হয়েছিল। তাই বর্তমানে বাংলাদেশে এদেরকে আদিবাসী হিসেবে উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে কিছু বিতর্কের সৃষ্টি হয়। এই বিতর্কের অবসানের জন্যে জি. এস. ঘুরিয়ের (১৯৬৩) মতামতকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। তাঁর মতে, যেহেতু তথাকথিত অ্যাবরিজিনাদের অনেকেই দক্ষিণ এশিয়ার অন্যত্র থেকে তাদের বর্তমান বাসভূমিতে চলে আসে, সেহেতু তাদের বর্তমান বসতিতে আদি অধিবাসী বলা যায় না। যদিও তিনি যোগ করেছেন যে, তারা তাদের অধিকৃত ঐ একই এলাকার নাও হতে পারে, তবু তারা দক্ষিণ এশিয়ার আদি অধিবাসী এবং এই অর্থে তাদের আদিবাসী বা অ্যাবরিজিন বলা যেতে পারে। এসকল দিক বিবেচনায় চা-শ্রমিকদেরকে 'আদিবাসী' হিসেবে উপস্থাপন করা যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করা হচ্ছে।

আলোচনায় একটি ধাপ হিসেবে 'সংস্কৃতায়নকে' বিবেচনা করা হয়েছে। বর্তমান সময়ে চা-শ্রমিকরা সংস্কৃতায়নের প্রক্রিয়া দ্বারা পরিবর্তিত একটি জনগোষ্ঠী। সংস্কৃতায়ন হল এমন প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একটি নীচু জাতি বা গোষ্ঠী তার লোকাচার, ক্রিয়াবিধি, মতাদর্শ ও জীবনচর্চাকে একটি উচুঁ এবং প্রায়শই দ্বিজ জাতির আদলে পরিবর্তিত করে। এ পরিবর্তনের দাবির স্বীকৃতি পেতে লেগে যায় বেশ কিছু সময়, বলতে কি, দু-এক পুরুষ। এথনিক জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে এম.এন. শ্রীনিবাস (১৯৯৩) মন্তব্য করেন, এই প্রক্রিয়ায় একসময় দেখা যেত নিম্নজাতি উচ্চজাতির আচার-ব্যবহার, আদব-কায়দা অনুকরণ করে দাবি জানাচ্ছে যে তারা মোটেই নিকৃষ্ট নয়, ধর্মচরণের ক্ষেত্রে তারা উচ্চ জাতিরই সমান। এই দাবির সঙ্গে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যুক্ত থাকত নবলব্ধ আর্থিক বা রাজনৈতিক ক্ষমতা যার জোরে সেই জাতি ধর্মচারের ক্ষেত্রেও অধিকতর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার

চেষ্টা করত। সাম্প্রতিককালে সম্পূর্ণ বিপরীত একটা দাবি শোনা যাচ্ছে, নিম্নজাতি আর বলেনা ধর্মাচারের ক্ষেত্রে আমরা উচ্চের সমান বরং বলে আমরা পৃথক, অবদমিত, বঞ্চিত। জাতিভিত্তিক দাবী জানানোর ক্ষেত্রে উচ্চতর জাতির সঙ্গে ধর্মীয় বা আচরণগত মিল নয় বরং তাদের সাথে সামাজিক পার্থক্য প্রতিষ্ঠা করেই 'নিম্নতর' জাতি রাষ্ট্রের কাছে পৃথক সুযোগ সুবিধা প্রতিষ্ঠা করছে।

৩. বালুচর এলাকার চা-শ্রমিক জনগোষ্ঠী

সিলেট জেলার বালুচর এলাকায় বসবাসরত আদিবাসী চা-শ্রমিক জনগোষ্ঠী পূর্বপুরুষের পেশা দ্বারা সমাজে চা-শ্রমিক জনগোষ্ঠী বা 'কুলি' হিসেবে পরিচিত। বর্তমানে তাদের পেশা বহুধাবিভক্ত হয়ে গেলেও চা-শ্রমিক হিসেবে তারা সর্বত্র পরিচিতি পায়। তারা একটি স্বতন্ত্র্য জীবন-যাপন পদ্ধতির অধিকারী, দৈহিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে স্বতন্ত্র, ভাষা ভিন্ন, এবং সর্বোপরি উৎসগত পরিচিতি অন্য সকলের চেয়ে আলাদা। তাই স্বাভাবিকভাবে তারা 'আদিবাসী' হিসেবে সকলের কাছে পরিচিত। কিন্তু তার পরও তাদের নিজস্ব উৎসগত ইতিহাস সকলের কাছে বিস্মৃত। তাদের কোন নিজস্ব পরিচয় নেই। পেশার দ্বারা তারা নিম্নবর্ণ হিসেবে পরিচিত, যা সামগ্রিকভাবে কোন পরিচয় বহন করে না। এই জনগোষ্ঠী কিছু উপাধি দ্বারা পরিচিত হয়ে থাকে। এর মাঝে উল্লেখযোগ্য হল- মাল, উরাং, মুড়া, তিরকী, পানিওয়া, টম্পা, কেরকেটা এবং মিন।

এই উপাধিগুলোর মধ্যে আবার বিভাজন রয়েছে। যেমনঃ মাল উপাধিধারীরা দুটো ভাগে বিভক্ত রাজপূত ও সাধারণ মাল। একই গোষ্ঠীর এই দুটো শাখার মধ্যে বৈবাহিক যোগাযোগ সামাজিকভাবে প্রশংসিত নয়। রাজপূতরা সাধারণত উঁচু জাত বলে বিবেচিত হয় এবং তারা সাধারণ মাল জাতের লোকের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হতে পছন্দ করে না। তবে সাধারণ মাল জাতের লোকেরা সবসময়ই আশা করে রাজপূত শ্রেণীর সাথে বৈবাহিক বা আত্মীয় সম্পর্ক স্থাপন করতে। এই জনগোষ্ঠী সামাজিক নিয়ম-কানুনের ক্ষেত্রে খুব বেশি কঠোর নয়। সমাজে গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে থাকার জন্য তারা কিছু নিয়ম-কানুন মেনে চলে এবং নিয়ম অমান্যকারীর জন্য গোষ্ঠী প্রধান বা সর্দার দ্বারা শাস্তিরও বিধান রয়েছে। তবে তার কোনটিই সর্বশেষ ফলাফল বলে বিবেচিত হয় না। তারা ব্যক্তিস্বাধীনতার চর্চা করে এবং কোন সামাজিক নিয়মকেই নিজস্ব ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর স্থান দেয় না।

বিবাহের ক্ষেত্রে এই আদিবাসী সম্প্রদায়ের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হল- পাত্র-পাত্রী যখন মনস্থির করে তারা বিয়ে করবে, তখন বিয়ের আগে তারা ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায়। তাদেরকে যখন খোঁজাখুঁজির মাধ্যমে পাওয়া যায় না, তখন অভিভাবকরা তাদের বিবাহের বিষয়টি একরকম স্বীকৃতি দেয়। কিছু দিন পর তারা নিজ নিজ বাসভবনে ফিরে আসে এবং গোষ্ঠীর নিয়মে তাদের বিয়ে হয়। ধর্ম এক সময় আদিবাসী এই জনগোষ্ঠী তাদের নিজস্ব নিয়মে পূঁজা পালন করত। তারাই পূজারী, তারাই পুরোহিত, তারাই নিয়ম তৈরি করত এবং প্রয়োজনে ভাঙ্গত। তাদের নিজস্ব পূঁজার মধ্যে রয়েছে ঃ বিসরী পূঁজা, চুরুক পূঁজা, চুরক পূঁজা, কির্তন পূঁজা, উদয় অস্ত পূঁজা, দোল পূঁজা এবং সর্প পূঁজা। কিন্তু এখন এরূপ

অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। এখন উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ ছাড়া তারা পুরোহিতের কাজ অন্য কাউকে দিয়ে সম্পাদন করায় না। সময়ের সাথে সাথে প্রচলিত হিন্দু ধর্ম ও তার নিয়ম-কানুন পালনের কঠোরতার দিকে তাদের ঝোঁক বাড়ছে।

পেশাগত দিক থেকে চা চাষের সাথে তারা বংশানুক্রমে যুক্ত। এখান থেকে প্রাপ্ত সুবিধা ও অর্থ তাদের জীবিকা নির্বাহের প্রধান উৎস। এছাড়া আশেপাশের পতিত জমি ও জঙ্গল পরিষ্কারের দ্বারা চাষাবাদ করে প্রাত্যহিক আহারের ব্যবস্থা করে থাকে। তাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও খাদ্রসামগ্রী তারা নিজেরাই উৎপাদন করত। ফলে নগদ অর্থের সাথে তাদের পেশাগত লেনদেন কম ছিল। তবে বর্তমানে তাদের কাজের ধরণ বহুলাংশে বদলে গেছে। লোকালয়ের পাশে বসবাস করায় তাদের নগদ অর্থের প্রয়োজনীয়তা এখন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে ব্যবসা, বাণিজ্য ও চাকুরীসহ নানা পেশায় তারা যুক্ত হয়ে পড়েছে। তাদের আয়ের উৎস যেমন পরিবর্তিত হয়েছে, তেমনি জীবন যাপন পদ্ধতিতেও এসেছে পরিবর্তন। চা-শ্রমিক জনগোষ্ঠীর রয়েছে আত্মরক্ষার ঐতিহ্যবাহী কৌশল। তাদের প্রত্যেকের বাড়িতে লুকিয়ে রাখা আছে তীর-ধনুক। চা-শ্রমিকদের মতে এই তীর-ধনুক এত শক্তিশালী যে বন্দুক থেকেও বেশি এর ক্ষমতা। বন্দুকের গুলি এদিক-ওদিক লাগলে মানুষ বেঁচে যেতে পারে, কিন্তু তীর কারও গায়ে সামান্যতম লাগলে তার বেঁচে থাকার সম্ভাবনা নেই। এই তীর-ধনুক চা-শ্রমিকদের নিজস্ব সম্পত্তি ও ঐতিহ্য।

এসকল চা-শ্রমিকরা সাধারণত পিতৃধারার অনুসারী। পিতার মৃত্যুর পর ছেলেরা উত্তরাধিকার সম্পত্তি লাভ করে। বিধবা মা ছেলেদের সাথে থাকে। বিয়ের পর মেয়েরা স্বামীর বাড়িতে চলে যায় এবং সেখানেই তাদের ভরণ-পোষণ নির্ধারিত হয়। সামাজিক নেতৃত্বের ক্ষেত্রে আবার ছেলে পিতার স্থলাভিষিক্ত হয় না। এক্ষেত্রে পিতা যদি সমাজের নেতৃস্থানীয় একজন হয় তাহলে তার মৃত্যুর পর তার স্থলাভিষিক্ত কে হবেন তা বাকী নেতারা বসে ঠিক করে। এই নেতৃত্ব উত্তরাধিকার সূত্রে বর্তায় না। এরা শহরের মাঝে বাস করায় নিজস্ব সংস্কৃতির চর্চা যেমন করে তেমনি বৃহত্তর সংস্কৃতির দ্বারাও প্রভাবিত হয়।

৪. পরিবর্তন ও প্রান্তিকীকরণ

ক) জমির মালিকানা পরিবর্তনের প্রক্রিয়া

বালুচর এলাকায় চা-শ্রমিকদের প্রান্তিকীকরণ প্রক্রিয়া বিভিন্নভাবে সংগঠিত হচ্ছে। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয় নিয়মনীতি, ইত্যাদি বিভিন্ন পন্থায় এ প্রান্তি কীকরণ প্রক্রিয়া সংগঠিত হয়। তার মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য চা-শ্রমিকদের ভূমি দখলের পন্থা। কখনও জোরপূর্বক আবার কখনও কৌশলের দ্বারা বাঙ্গালিদের মধ্যে কিছু ক্ষমতাশীল ব্যক্তি চা-শ্রমিকদের কাছ থেকে জমি ক্রয়ের নামে কৌশলে টিপসই আদায় করে নেয়। ক্ষমতাশীল ব্যক্তিরা তাদের লোক দিয়ে এদেরকে জমি বিক্রির জন্য মানসিক ও শারিরীক চাপ প্রদান করে। যেসকল ভাষাগত কৌশল ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে আছে "তোমরা জমি এখনই বিক্রি করে দাও, তাহলে ভাল দাম পাবে না হলে কিছুদিন পর জমি

দখল হয়ে যাবে তখন এক পয়সাও পাবে না" অথবা "জমি বিক্রি না করে কিভাবে ঘরে থাক- দেখে নিব" ইত্যাদি। এভাবে চা-শ্রমিকরা তাদের নিজ হাতে গড়া সম্পত্তি পানির দামে অর্থাৎ এই জমি দখল করে নিয়ে দখলদাররা যে বাজার দরে বিক্রি করবে তার চেয়ে অনেক কম দামে জমি বিক্রি করতে বাধ্য হয়। যেমন, বালুচর এলাকার সমস্ত জায়গার সিংহভাগের মালিক ছিল জম্বু উড়াং, বর্তমানে ভিটে-মাটি ছাড়া, অবশিষ্ট তার আর কিছুই নেই। এর কারণ হিসেবে ৩টি বিষয়কে এখানে নির্ধারণ করা যায়, যথাঃ ক) কাঁচা টাকার চাহিদা, খ) জায়গা জমি রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষার অভাব। গ) বাঙ্গালিদের প্রতারণা, অবিশ্বস্ততা এবং জমি দখলে ক্ষমতা প্রয়োগ এখানকার আদিবাসীরা তাদের জায়গা জমির দলিল বিশ্বাস করে এক বাঙ্গালি মুহুরীর কাছে জমা রাখে। পরবর্তীতে সেই দলিলগুলোও তারা আর হস্তগত করতে পারেনি।

আদিবাসীরা যে প্রেক্ষাপটে বেড়ে উঠেছে সেখানে নগদ টাকার লেনদেনের সাথে তারা খুব কমই পরিচিত ছিল। নিদারুন অভাব অনটনের মাঝে সামান্য কিছু মজুরী দিয়ে তাদেরকে সারা বছর কাটাতে হত। সেক্ষেত্রে হঠাৎ কিছু টাকা একসাথে দেখলে তারা খুশি হয়ে যায় এবং অনেক কম টাকার বিনিময়ে তাদের কাছ থেকে অনেক মূল্যবান সম্পদও হাতিয়ে নেয়। আর এরূপ বোকামির মূল্য তারা বেশিরভাগ সময় দিয়ে আসছে। কিছু নগদ অর্থের মালিকরা আদিবাসীদের পরিবারের কাউকে কিছু টাকা দিয়ে জমি বিক্রির সম্মতি বা টিপসই আদায় করে নেয়। অনেক সময় অন্যান্য সদস্যরা জানেই না যে তাদের পরিবারের একজন জমি বিক্রি করে দিচ্ছে। যখন সেই জমি দখল হয়ে যায় তখন সকলে প্রতিবাদ করলে সেই টিপসই সামনে তুলে ধরে, তখন আর কিছু করার থাকে না।

জমি বিক্রির আরেকটি ধরণ তাদের মধ্যে প্রচলিত সেটা হল, জমি বিক্রি করলেও কখনও তাদেরকে টাকা একসাথে দেয়া হয় না। এজন্য তাদেরকে দিনরাত ক্রেতার পিছে ঘুরতে হয়। প্রকৃতমূল্যের অর্ধেকেরও কম টাকা দিয়ে তাদেরকে বিদায় করে দেয়া হয়। এরপর আর কোনও হিসেব থাকেনা। বাস্তব বাজারদর সম্পর্কে ধারণা কম থাকায় ১-২ লক্ষ টাকার জমি ১০-১২ হাজার টাকায় তারা বিক্রি করতে রাজী হয়ে যায়। সেই সাথে আছে প্রভাবশালীদের কথার মারপ্যাঁচ। ফলে অন্যকোন উপায়ান্তর ও ক্রেতা না দেখে তারা নামমাত্র মূল্যে জমি বিক্রি করে। দেখা গেছে এধরণের শোষণে এলাকার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, চেয়ারম্যান ও প্রভাবশালী ব্যক্তিরা জড়িত থাকেন।

এক্ষেত্রে জনশ্রুতি আছে যে চা-শ্রমিকদের মদ্যপানের অভ্যাসটি গড়ে তুলেছিল ইংরেজরা, যাতে তাদের উপর যে অত্যাচার করা হয় সে ব্যাপারে তাদের বোধশক্তি দীর্ঘস্থায়ী না হয়। বর্তমানে চা-শ্রমিক বিশেষ করে বৃদ্ধদের মাঝে এই অভ্যাসটি প্রচলিত আছে এবং এরই সুযোগ নিচ্ছে ক্ষমতাশীল ব্যক্তিগণ। তারা চা-শ্রমিকদের জমি বিক্রির জন্য কিছু নগদ অর্থ প্রদান করে, আর মদ্যপানের নিমন্ত্রণ করে। মদ্যপানের দ্বারা শ্রমিকরা তাদের কান্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলে এবং যেভাবে বলা হয় তারা তা-ই করে। ফলে এসময় তাদের কাছ থেকে স্বাক্ষর বা টিপসই আদায় করা খুব সহজ ব্যাপারে পরিণত হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে টিপসই

খ) সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রান্তিকীকরণ

একসময় এ চা-শ্রমিকদের আদিবাস ছিল ভারতে, তাই সেখানকার ধর্ম অনুযায়ী তারা হিন্দু ধর্মকে তাদের পরিচিতির অংশ হিসেবে নির্বাচন করে। এজন্য দেখা যায় বর্তমান প্রজন্মের পূর্বপুরুষ যতটা ধার্মিক তার চেয়ে অনেক বেশি ধার্মিক বর্তমান প্রজন্ম। এটা জনগোষ্ঠীর একটা উল্লেখযোগ্য দিক। তারা প্রচলিত হিন্দু ধর্মের মধ্যে তাদের আত্মপরিচয়ের আশ্রয় খোঁজে। কারণ ধর্মের একটি গুরুত্ব ও আধিপত্য আছে সমাজে এবং এটি এই চা-শ্রমিকদের একটি বৃহত্তর গোষ্ঠীর আওতাধীন করে। ধর্ম যে একটা আলাদা পরিচয় হতে পারে এটা তাদের কাছে ছিল খুবই অজানা। তাদের মধ্যে পূঁজা পার্বনের রীতি ছিল, কিন্তু সেটা ছিল তাদের আশেপাশের ভয়কে দূর করার জন্য। তাদের কাছ থেকে জানা গেছে যে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ধর্ম বা দেবী পূঁজার প্রচলন তাদের মাঝে ছিল না। তবে বর্তমান প্রজন্ম সম্পূর্ণভাবে নিজেরদেরকে হিন্দু বলে দাবী করে এবং হিন্দু ধর্মের সকল নিয়ম কানুন তারা পালন করে।

বর্তমান প্রজন্মে লক্ষণীয় পরিবর্তন হচ্ছে তারা পূর্বপুরুষের মদ্যপানের অভ্যাসকে গর্হিত অপরাধ মনে করে। তাদের মতে মদ খেয়ে তাদের যে ক্ষতি হয়েছে অন্য কোনভাবে তা হয়নি। এভাবে একসময় তাদের সকল পূঁজা পার্বন ও কীর্তনে মদ্যপান হত, মনের আনন্দে বাদ্যযন্ত্র বাজান হত, রাতভর চলত বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের উৎসব। কিন্তু এখন আর এই রীতিতে পূঁজা পালন হয় না। এখন প্রচলিত হিন্দু ধর্ম অনুযায়ী তারা মন্দিরে যায়, প্রসাদ আনে, প্রসাদ বিতরণ করে এবং অত্যন্ত পূর্ণ ও তথাকথিত মার্জিত উপায়ে তাদের পূঁজা পালন করে। কিন্তু এ সংস্কৃতায়ন দ্বারা হারিয়ে গেছে তাদের নিজস্বতা, নিজস্ব রীতিতে জীবন-যাপনের পদ্ধতি, পূঁজা পার্বনের আনন্দ। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষাও মূলধারার জনগোষ্ঠীর স্বার্থ কেন্দ্রিক চিন্তাধারার উপর নির্ভরশীল। তার প্রমাণ পাওয়া যায় একটি ঘটনা থেকে। এক চা-শ্রমিক তার জমি বিক্রি করে এক বাঙ্গালি ব্যক্তির কাছে। জমি মাপতে গিয়ে দেখা যায় একটি মন্দির তার সীমানার মধ্যে পড়ে গেছে। আদিবাসীরা অনুরোধ করে মন্দিরটি রক্ষার জন্যে। তিনি তা না শুনে প্রতিশ্রুতি দেন যে তিনি পরে একটি মন্দির তৈরি করে দেবেন। আজ পর্যন্ত তাদের সেই মন্দির তৈরি হয়নি। উপরন্তু তাদের সেই পুরনো মন্দির ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। একসময় পূঁজা পার্বনে তারা সেখানে যেত, সবার সাথে মিলিত হত, ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করত, তাদের সেই একটিমাত্র স্থানও ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে ও বাঙ্গালিদেরও নতুন আবাসস্থল গড়ে তোলা হয়েছে।

বালুচর এলাকায় বসবাসরত চা-শ্রমিকরা যদিও তাদের আদি পেশা চা-শ্রম থেকে বেরিয়ে এসেছে এবং বর্তমানে বিভিন্ন পেশা গ্রহণ করেছে তথাপি তাদের মধ্যে পেশার ক্ষেত্রে বাছবিচার আছে। তারা মনে করে যে, সামাজিকভাবে তারা একটা সম্মানের অধিকারী। ফলে যেকোন পেশায় তারা নিয়োজিত হয় না। তারা যে কাজটি বেশি করে সেটা হল দুধ বিক্রি এবং এ কাজে চা-শ্রমিকরা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে নিয়োজিত হয়। তবে রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নত সুযোগ সুবিধার অভাবে তাদের গৃহপালিত পশু বিশেষ করে গরুর পরিমাণও কমে

যাচ্ছে। এছাড়া বর্তমান প্রজন্মের অনেকেই বিদেশে যেতেও আগ্রহী। এজন্য অনেকেই জমি বিক্রি করে নগদ অর্থ খরচ করেছে।

এরপরও চা-শ্রমিকরা পার্শ্ববর্তী বাঙ্গালিদের সাথে মেলামেশার ক্ষেত্রে একধরণের দূরত্ব বজায় রাখে এবং সমাজ ব্যবস্থাকে এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে এখনও এসকল চা-শ্রমিকরা পাশ্ববর্তী বাঙ্গালিদের ঘরে অবাধ যাতায়াত করে না। ভদ্রলোকের বাড়িতে আসলে তারা জুতো ও সেন্ডেল খুলে বাড়িতে প্রবেশ করে এবং প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করে চলে যায়। আবার চা-শ্রমিকদের ঘরেও বাঙ্গালিদের যাতায়াত কম। তবে তাদের মধ্যে সৌহার্দ্য ঠিকই বজায় থাকে। তবে চা-শ্রমিক ও বাঙ্গালি জনগোষ্ঠীর মধ্যে বৈবাহিক কোন সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না এবং উভয় পক্ষই এই সামাজিক নিয়ম মেনে চলে। অর্থাৎ জাত-পাত প্রথা ভিন্ন আঙ্গিকে এখনও সমাজে বিদ্যমান আছে। তবে নিয়মকে যে সামাজিক অনুশাসন দ্বারা থামিয়ে রাখা যায় না তার প্রমাণও সমাজে দেখা যায়। চা-শ্রমিক গোষ্ঠীর মধ্যে এ ব্যাপারে ধর্মীয় অনুশাসন খুব বেশি কঠোর নয়। কিন্তু সামাজিকভাবে এই নিয়মটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। আর মূলধারার জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে এরূপ বিধিনিষেধ চা-শ্রমিকদেরকে আরও বেশি গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বাস করতে শেখায়। তাদের নিজেদের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন অত্যন্ত দৃঢ়। ফলে তাদের বিকাশ নিজস্ব পরিমন্ডলেই থেকে যায়।

শিক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমান প্রজন্মের চা-শ্রমিকরা অনেকেই মাধ্যমিক পর্যন্ত অধ্যায়ন করেছে। এরপর উচ্চমাধ্যমিক ও এরও উচ্চ পর্যায়ে লেখাপড়ার সংখ্যা কমে যায়। এর কারণ হিসেবে পড়াশুনায় অনীহা, লেখাপড়ার যোগান মেটানোর অক্ষমতা, আধুনিক শিক্ষার জটিলতা ইত্যাদি বিষয়কে চিহ্নিত করা যায়। এছাড়া তাদের মধ্যে নারী শিক্ষার হার কম এবং নারীদেরকে ঘরের কাজকর্মে আবদ্ধ রাখাকেই তারা সমীচীন মনে করে। এতে করে অল্প বয়সে ছেলে মেয়েকে বিয়ে দেয়ার রীতি এখনও এ জনগোষ্ঠীর মাঝে দেখা যায়। শিক্ষিত নতুন প্রজন্ম তাদের পূর্ব পুরুষের অজ্ঞতাকে ঘোচানোর ক্ষেত্রে সাহায্য করছে এবং লেখাপড়া সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে তাদের কাছে গেলে তারা সাহায্য করে। এতে করে সমাজের উপকার হয়েছে। আবার এসকল শিক্ষিত যুবকরা অনেক সময় ক্ষমতাশীল বাঙ্গালি জনগোষ্ঠীর হয়ে কাজ করে এবং আদিবাসীদের আরও বিপদে ফেলে দেয়। এমনকি তারা যে চা-শ্রমিকদের উত্তরসূরী এটাও স্বীকার করতে দ্বিধা বোধ করে। এভাবে চা-শ্রমিক এই জনগোষ্ঠী কোন দিক থেকেই নিশ্চিত সাহায্য পায় না।

৬. উপসংহার

সামাজিক-সাংস্কৃতিক দিক থেকে তাদের প্রান্তিকীকরণকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে তাদের ঐতিহ্য থেকে সরে আসার বিষয়টি দ্বারা। নিজস্ব আত্মপরিচয়ের সন্ধানে সংস্কৃতায়নের প্রভাবে আধুনিকতার দাবীতে চা-শ্রমিক জনগোষ্ঠী তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য, আচার-আচরণ থেকে বর্তমানে অনেক সরে এসেছে। বর্তমান প্রজন্ম এই ভদ্রলোক সমাজে একটি অবস্থান গড়ে নিতে চায়। আলোচ্য চা-শ্রমিক জনগোষ্ঠীর আদি পেশা ছিল চা-শ্রম। সেদিক থেকে তারা চা-শ্রমিক হিসেবে সামাজিকভাবে পরিচিত এবং বংশানুক্রমে চা-শ্রমের সাথে যুক্ত।

বর্তমানে এদের মূল পেশা যেমন চা-চাষ নয়, তেমনি এরা চা-বাগানের সংরক্ষিত এলাকায় বসবাস করে না। এরা লোকালয়ে বা শহরে বসবাস করে যাদের আশেপাশে বাঙ্গালি জনগোষ্ঠীর বসবাস। ফলে একদিকে তারা চা-শ্রমিকের বংশধর যারা নিজস্ব সংস্কৃতি, আচার-আচরণ, রীতিনীতি রক্ষা করে চলে অন্যদিকে এদের রয়েছে বৃহত্তর বাঙ্গালি সংস্কৃতির আধুনিকতার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করার অদৃশ্য তাগিদ। বাঙ্গালি অধ্যুষিত এলাকায় ক্ষমতার অসম বিন্যাস এ ক্ষুদ্রতর জনগোষ্ঠীকে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রান্তিক করছে। এই নিবন্ধে চা- শ্রমিক জনগোষ্ঠীর প্রান্তিকতার প্রেক্ষাপট দ্বারা বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রান্তিকতার বীজ কালের গভীরে নিহিত থাকে এবং দৈনন্দিন জীবনের অনেক মতাদর্শেও মাধ্যমে এই প্রান্তিকতা ভিন্নরূপে প্রকাশ পায়। কিন্তু বিলীন হয় না। এই ধাঁরাকেই প্রান্তিকীকরণ প্রক্রিয়ারূপে চিহ্নিত করা হয়েছে।

References

Ahmed A.F Salauddin 1994 *Bengali Nationalism and the emergence of Bangladesh*, An Introductory outline, Dhaka Printers Ltd. Dhaka

Anderson, B. 1991 *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. London: Verso

Barth, Fredrick 1996 *Ethnic Groups and Boundaries*, Londen: Allen

Cohan, Amber 1974 *Ethnicity in Barnard, Alan and Spencer*, Lonathan, (ed) Encyclopedia of Social Science and Cultural Anthropology, Routledge, London

Chatterjee, Partha 1993 *The Nation and its Fragments, Colonial and Post-colonial Histories*, Oxford :Princeton University Press

Eriksen, Thomas H. 1993 *Ethnicity & Nationalism, Anthropological Perspective*, Pluto Press, London

Guha, Ranajit (ed)1982 *Subaltern Studies: Writings on South Asian History and Society, Vol. 1*, Oxford India: Oxford University Press

Horowitz, Donald 1985 *Ethnic Groups in Conflict*

Srinivs, M.N. 2000 *Social Change in India*, Delhi: Orient Longman

Tambiah, S.J. 1989 *The politics of Ethnicity*

ঘুরিয়ে, জি. এস. (১৯৬৩), দি সিডিউল স্ট্রাইব। বোম্বে: পপুলার প্রেস

চট্টোপাধ্যায়, পার্থ ইতিহাসের উত্তরাধিকার, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

ভদ্র, গৌতম ও চট্টোপাধ্যায়, পার্থ, (সম্পাদনা) ১৯৯৮, নিম্নবর্গের ইতিহাস, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

ভেলাম ভান সেন্দেল ও এলেন বেল, (সম্পাদনাঃ), ১৯৯৮, বাংলার বহুজাতিঃ বাঙ্গালি ছাড়া অন্যান্য জাতির প্রসঙ্গ প্রথম প্রকাশঃ আই.সি.বি.এস